بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৩০ আগস্ট, ২০২৪ মোতাবেক ৩০ যহুর, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

বিগত খুতবাগুলোতে অর্থাৎ জার্মানি জলসার পূর্বে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের বরাতে আলোচনা হচ্ছিল এবং এতে হযরত আয়েশা (রা.)-র 'ইফক'-এর ঘটনারও উল্লেখ ছিল। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"খোদা তা'লা স্বীয় বৈশিষ্ট্যের মাঝে এটি নিহিত রেখেছেন যে, তিনি ওয়াঈদ (তথা শাস্তি) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীকে তওবা, এস্তেগফার, দোয়া এবং সদকার বিনিময়ে টলিয়ে দেন। অনুরূপভাবে মানুষকেও তিনি এই বৈশিষ্ট্যই প্রদান করেছেন। যেভাবে পবিত্র কুরআন ও হাদীস দ্বারা এটি সাব্যস্ত যে, হযরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কে মুনাফিকরা কেবল নোংরামীর বশবর্তী হয়ে বাস্তবতা বিবর্জিত অপবাদ আরোপ করেছিল, এই রটনায় কোনো কোনো সরলমনা সাহাবীও জড়িয়ে পড়েছিলেন। একজন সাহাবী এমন ছিলেন যে, তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-র বাড়িতে দুবেলা খাবার খেতেন। হযরত আবু বকর (রা.) তার এই অপরাধের জন্য শপথ করেন এবং ওয়াঈদ (তথা শাস্তি) স্বরূপ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আমি এই অপকর্মের শাস্তিস্বরূপ তাকে কখনো খাবার দিবো না। এ (ঘটনার) প্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল যে, وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (সূরা নূর: ২৩) তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন এবং যথারীতি আবার তাকে খাবার দিতে আরম্ভ করেন।"

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "এ কারণেই এটি ইসলামী বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত যে, যদি ওয়াঈদরূপে কোনো প্রতিজ্ঞা করা হয় তবে তা ভঙ্গ করা উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যভুক্ত। যেমন, কেউ যদি তার সেবক সম্পর্কে কসম খায় যে, আমি অবশ্যই তাকে পঞ্চাশ জুতা মারবো– সেক্ষেত্রে তার (অর্থাৎ সেবকের) তওবা ও অনুতাপের কারণে ক্ষমা করে দেওয়া ইসলামী রীতিসম্মত; যেন সে তাখাল্লুক বিআখলাকিল্লাহ্ (তথা আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত) হয়ে যায়। কিন্তু ওয়াদা তথা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা বৈধ নয়। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য জবাবদিহি করতে হবে কিন্তু ওয়াঈদ ভঙ্গের কারণে নয়।"

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তকে বুখারী শরীফের আলোকে ইফক-এর ঘটনা বর্ণনা করেন এবং এ সম্পর্কে লিখেন, 'এ বিষয়ে এই রেওয়ায়েতটি অন্য সব রেওয়ায়েতের তুলনায় বিশদ ও নিরবচ্ছিন্ন আর যেসব বিষয় অন্যান্য বর্ণনাকারীর বর্ণনা থেকে পৃথক খণ্ডরূপে পাওয়া যায় তা এই হাদীসে একত্রিত হয়েছে। এছাড়া এই হাদীস দ্বারা মহানবী (সা.)-এর পারিবারিক জীবনের এমন এক জ্ঞানগর্ভ বিষয়ে আলোকপাত হয় যা কোনো ঐতিহাসিক উপেক্ষা করতে পারে না। নির্ভরযোগ্যতার নিরিখেও এই হাদীস এমন উচ্চমানে অধিষ্ঠিত যাতে কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। এখন লক্ষণীয় বিষয় হলো, এটি কীরূপ ভয়ানক নৈরাজ্য ছিল যা মুনাফিকদের পক্ষ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। এর মাধ্যমে কেবল একজন সতীসাধ্বী, অতিশয় খোদাভীরু ও

পুণ্যবতী নারীর সতীত্বের ওপর আক্রমণ করাই উদ্দেশ্য ছিল না; বরং মূল উদ্দেশ্য ছিল, পরোক্ষভাবে ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার সম্মানকে ধূলিসাৎ করা এবং ইসলামী সমাজে এক ভয়ংকর কম্পন সৃষ্টি করা। আর মুনাফিকরা এই নোংরা ও হীন প্রচারণাকে এরূপে প্রচার করেছিল যে, কতক সরলমনা কিন্তু খাঁটি মুসলমানও তাদের প্রবঞ্চনার শিকার হয়ে হোঁচট খেয়েছিল। (তাদের ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার শিকার হয়েছিল।) তাদের মধ্যে কবি হাস্‌সান বিন সাবেত, যয়নাব বিনতে জাহাশের বোন হামনা বিনতে জাহাশ এবং মিসতাহ্ বিন উসাসাহ্-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.)-র এটি একটি মহান চারিত্রিক গুণ যে, তিনি তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তাদের সম্বন্ধে নিজের হৃদয়ে কোনো প্রকার অসন্তোষ পুষে রাখেন নি। রেওয়ায়েত এসেছে, এরপর যখনই হযরত হাস্‌সান বিন সাবেত (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)-র সাথে সাক্ষাৎ করতে আসতেন তখন তিনি খুবই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার সাথে সাক্ষাৎ করতেন। একদা (তিনি) হযরত আয়েশা (রা.)-র সমীপে উপস্থিত হন, তখন মাসরূক নামের একজন মুসলমানও সেখানে উপস্থিত ছিল। মাসরূক বিস্ময়ের সাথে বলে, আপনি হাস্‌সানকে আপনার কাছে আসার অনুমতি দিচ্ছেন! হযরত আয়েশা (রা.) উত্তরে বলেন, **'বাদ দাও, বেচারা চোখের সমস্যায় ভুগছে, এটা কি তার জন্য কম কষ্টের কারণ?'** (তার চোখে রোগ দেখা দিয়েছিল)। এরপর হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, **'এছাড়া আমি তো একথা ভুলতে পারি না যে, হাস্‌সান মহানবী (সা.)-এর সমর্থনে এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে কবিতা আবৃত্তি করতেন।'** অতএব, হযরত হাস্‌সানকে অনুমতি দেয়া হলে তিনি ভেতরে এসে বসেন এবং হযরত আয়েশা (রা.)-র প্রশংসায় এই পঙক্তি পাঠ করেন,

حصان رزان ماتزن بريب

وتصبح غرثى من لحوم الغوافل

(উচ্চারণঃ 'হাসানুন রেযানুন মা তাযান্নু বিরীবা, ওয়া তুসবিহু গারছা মিন লুহূমিল্ গওয়াফিল')

অর্থাৎ তিনি একজন সতীসাধ্বী ও পুণ্যবতী রমণী এবং বিদুষী ও বুদ্ধিমতি নারী আর তার অবস্থান সন্দেহ ও সংশয়ের ঊর্ধ্বে। আর তিনি কোনো উদাসীন ও নিরপরাধ নারীর মাংস ভক্ষণ করেন না অর্থাৎ তাদের প্রতি অপবাদ আরোপ করেন না এবং তাদের সম্বন্ধে কোনো গীবত (বা পরচর্চাও) করেন।

হযরত আয়েশা (রা.) এই পঙক্তি শুনে বলেন, **'ওয়ালাকিন আন্‌তা',** আরেক বর্ণনায় এটিও এসেছে **'লাসতা কাযালিকা';** অর্থাৎ তোমার নিজের অবস্থা কী? তুমি তো এই গুণের অধিকারী সাব্যস্ত হও নি। অর্থাৎ তুমি তো আমার মতো নিরপরাধের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপে অংশ নিয়েছ। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) প্রাচ্যবিদ ম্যুর সাহেবের বরাত দিয়ে লিখেন, ('ম্যুর-এর) আরবী পাণ্ডিত্য ও বিদ্বেষের একটি উদাহরণ দেখুন! (তিনি) এই পঙক্তির একেবারে ভুল ও আরবী ব্যাকরণের বিপরীত অর্থ করে লিখেছেন যে, হাস্‌সান (এখানে) হযরত আয়েশার কমনীয় শরীরের প্রশংসা করেছিল। তখন হযরত আয়েশা রসিকতা করে তার স্থুল দেহ সম্পর্কে ঠাট্টা করেন।

তিনি (রা.) লিখেন, ম্যুর সাহেব এই ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে আরও সুস্পষ্ট ভুল করেছেন। যেমন (তিনি) লিখেছেন, **'সাফওয়ান এবং আয়েশা পথিমধ্যে সেনাদলের কাছে পৌঁছতে পারেন নি আর পরবর্তীতে জনসমক্ষে তারা মদীনায় প্রবেশ করেন।'** অথচ একথা

একেবারেই ভুল ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, কেননা হাদীস এবং ইতিহাস থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, সাফওয়ান ও হযরত আয়েশা (রা.) কয়েক ঘণ্টা পরেই পথিমধ্যে ইসলামী সেনাবাহিনীর সাথে মিলিত হয়েছিলেন। তিনি (রা.) লিখছেন, কিন্তু মজার বিষয় হলো, মূল অপবাদ সম্পর্কে ম্যুর সাহেব হযরত আয়েশার নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। যেমন তিনি লিখেছেন, 'আয়েশার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জীবন বলে দেয় যে, তিনি এই অপবাদ থেকে মুক্ত ছিলেন। যদিও যৌক্তিক এবং দালিলিক প্রমাণের ভিত্তিতে এই অপবাদ পুরোপুরি ভ্রান্ত এবং মিথ্যা প্রতীয়মান হয়, কেননা এই সুস্পষ্ট আকস্মিক ঘটনা ব্যতীত যে, হযরত আয়েশা ইসলামী সেনাবাহিনীর পেছনে থেকে গিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে সাফওয়ানের সাথে সেনাবাহিনীর সাথে মিলিত হন– (এটি ছাড়া) অপবাদ আরোপকারীদের হাতে আর কোনো কিছু ছিল না। অর্থাৎ তাদের কাছে কোনো সাক্ষীও ছিল না, কিংবা অন্য কোনো প্রমাণও ছিল না। আর এটি জানা কথা যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো অভিযোগ প্রমাণিত না হয় ততক্ষণ সেটিকে আদৌ সত্য মনে করা হয় না। বিশেষত এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কে যাদের জীবন তাদের পবিত্র হবার সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু মুসলমানদের অধিক প্রশান্তির জন্য আর এই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ, ভবিষ্যতে এমন বিষয়াদির ক্ষেত্রে একটি নীতিগত পন্থা নির্ধারণ করার জন্য খোদার ওহী অবতীর্ণ হয় যা কেবল এই অপবাদকে নিতান্ত অসত্য আখ্যায়িত করে হযরত আয়েশা (রা.) এবং সাফওয়ান বিন মুআত্তাল (রা.)-র পবিত্রতা প্রকাশ করে নি, বরং ভবিষ্যতের জন্য এ জাতীয় ঘটনাবলি সংক্রান্ত এমন একটি মূলনীতি জগতের সামনে উপস্থাপন করে যার ওপর মানুষের সম্মান ও সম্ভ্রম এবং সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা আর জাতির (সবার) চরিত্রের সুরক্ষার মূল ভিত্তি অনেকাংশে নির্ভরশীল।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)-র প্রতি অপবাদ আরোপের কারণ সম্পর্কে বলেন,

আমাদের লক্ষ্য করা উচিত যে, হযরত আয়েশা (রা.)-র প্রতি যে অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল তার মূল উদ্দেশ্য কী ছিল? এর কারণ এটি হতে পারে না যে, হযরত আয়েশা (রা.)-র সাথে তাদের কোনো শত্রুতা ছিল। ঘরে অবস্থানকারী এক নারী, যার সাথে না রাজনীতির সম্পর্ক আছে, আর না বিচার বিভাগের, না পদের, আর না সম্পদ বণ্টনের, না লড়াইয়ের আর না বিরোধী জাতিগুলোর ওপর আক্রমণের, না রাজত্বের আর না অর্থনীতির– এমন নারীর সাথে কারো কী বিদ্বেষ থাকতে পারে? যেহেতু এসব বিষয়ের সাথে তার কোনো সম্পর্কই নেই। অতএব হযরত আয়েশা (রা.)-র সাথে সরাসরি বিদ্বেষের কোনো কারণ থাকতে পারে না। এই অপবাদের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ই ঘটতে পারে। হয় এই যে, নাঊযুবিল্লাহ্, এই অপবাদ সঠিক, যা কোনো মুমিন এক মুহূর্তের জন্যেও মেনে নিতে পারে না, বিশেষত যেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা আরশ থেকে এই নোংরা ধারণার অপনোদন করেছেন। আর দ্বিতীয়ত এটি হতে পারে যে, হযরত আয়েশা (রা.)-র প্রতি অপবাদ অন্য কতিপয় ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে আরোপ করা হয়েছে।

এখন আমাদের লক্ষ্য করা উচিত যে, তারা কারা ছিলেন যাদেরকে কলঙ্কিত করা মুনাফিক ও তাদের সর্দারদের জন্য লাভজনক হতে পারতো এবং মুনাফিকরা এভাবে কাদের প্রতি তাদের শত্রুতা প্রকাশ করতে পারতো। সামান্য চিন্তাভাবনা করলেও বুঝা যায়, সামান্য মনোযোগেও বোঝা যায় যে, হযরত আয়েশা (রা.)-র প্রতি অপবাদ আরোপের মাধ্যমে দুজন ব্যক্তির প্রতি শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ করা যেতো। প্রথমত, মহানবী (সা.)-এর প্রতি আর দ্বিতীয়ত, হযরত আবু বকর (রা.)-র প্রতি, কেননা তিনি (অর্থাৎ আয়েশা) ছিলেন একজনের

সহধর্মিণী আর অন্যজনের কন্যা। এ দুজন ব্যক্তিই এমন যে, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের কলঙ্কিত করা শত্রুদের ক্ষেত্রে কতক ব্যক্তির জন্য লাভজনক হতে পারত কিংবা কতক ব্যক্তির স্বার্থ তাদেরকে দুর্নাম করার সাথে জড়িত ছিল। নতুবা শুধুমাত্র হযরত আয়েশা (রা.)-কে কলঙ্কিত করার প্রতি কারো কোনো আগ্রহ থাকতে পারে না। খুব বেশি হলে তাঁর দুর্নামের সাথে তাঁর সতীনদের সম্পর্ক থাকতে পারে। অর্থাৎ তাঁর সতীন বা মহানবী (সা.)-এর অন্য সহধর্মিণী যারা ছিলেন, তাদের সম্পর্ক থাকতে পারতো। আর এই ধারণা হতে পারত যে, সম্ভবত হযরত আয়েশা (রা.)-র সতীনরা মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে হযরত আয়েশাকে হেয় করার জন্য এবং নিজেদের সুনাম কুড়ানোর উদ্দেশ্যে এক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যে, হযরত আয়েশা (রা.)-র সতীনরা এক্ষেত্রে কোনো অংশ নেয় নি। বরং হযরত আয়েশা (রা.)-র নিজের বর্ণনা হলো, মহানবী (সা.)-এর সহধর্মিণীদের মধ্য থেকে যাকে আমি আমার প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতাম তিনি ছিলেন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)। তিনি ছাড়া অন্য কাউকে আমি নিজের প্রতিযোগী ভাবতাম না, কেননা তিনিই বেশি কথা বলতেন। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি যয়নবের এই অনুগ্রহকে কখনো ভুলতে পারব না যে, আমার প্রতি যখন অপবাদ দেয়া হয় তখন সবচেয়ে জোরালোভাবে যদি কেউ সেই অপবাদ প্রত্যাখ্যান করেছিল তবে তিনি ছিলেন যয়নব (রা.)। অতএব হযরত আয়েশা (রা.)-র সাথে যদি কারো শত্রুতা থাকে তাহলে তার সতীনদেরই থাকার কথা। আর তারা চাইলে এতে অংশ নিতে পারতেন, যেন হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হন এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ অন্য স্ত্রীদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, তারা এ ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করেন নি। আর যদি কারো কাছে জিজ্ঞেস করা হয়, অর্থাৎ সেই সতীনদের মধ্য থেকে বা অন্য স্ত্রীদের মধ্য থেকে কাউকে যদি জিজ্ঞেসও করা হয়ে থাকে, তাহলে তিনি হযরত আয়েশার প্রশংসাই করেছেন।

মোটকথা নারীদের প্রতি পুরুষদের শত্রুতার কোনো কারণ নেই। অতএব, তার প্রতি অপবাদ হয় মহানবী (সা.)-এর প্রতি বিদ্বেষের কারণে আরোপ করা হয়েছে অথবা হযরত আবু বকর (রা.)-র প্রতি বিদ্বেষের কারণে এরূপ করা হয়েছে। মহানবী (সা.) যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, তা অপবাদ আরোপকারীরা কোনোভাবে কেড়ে নিতে পারতো না। যে বিষয়ে তাদের ভয় ছিল সেটি হচ্ছে মহানবী (সা.)-এর (তিরোধানের) পরও তারা তাদের উদ্দেশ্য পূরণ হতে বঞ্চিত না রয়ে যায়। তারা দেখছিল যে, তাঁর (সা.) পর খলীফা হবার যোগ্য কেউ যদি থেকে থাকে তাহলে তিনি হলেন হযরত আবু বকর। অতএব এই আশঙ্কার কথা ভেবে তারা হযরত আয়েশার প্রতি অপবাদ আরোপ করে যেন হযরত আয়েশা মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হন এবং তার হেয় প্রতিপন্ন হবার কারণে হযরত আবু বকরের মুসলমানদের মধ্যে যে মর্যাদা ছিল তা-ও হ্রাস পেতে থাকে আর মুসলমানরা তাঁর প্রতি কুধারণা করে সেই বিশ্বাস ও আস্থা ত্যাগ করে যা তাঁর প্রতি তাদের ছিল। আর এভাবে রসূলে করীম (সা.)-এর পর হযরত আবু বকরের খলীফা হবার দরজা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। এ কারণেই খোদা তা'লা হযরত আয়েশার প্রতি অপবাদ আরোপের ঘটনার পর কুরআন শরীফে সূরা নূরে খিলাফতেরও উল্লেখ করেছেন।

হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাহাবীদের পরস্পরের সাথে কথাবার্তা হতো এবং তারা বলতেন, রসূলে করীম (সা.)-এর পর যার মর্যাদা রয়েছে তিনি হলেন আবু বকর (রা.)। হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলে করীম (সা.) একবার হযরত আয়েশাকে

বলেন, হে আয়েশা! আমি চাচ্ছিলাম, আবু বকরকে আমার পর স্থলাভিষিক্ত করে যাই। কিন্তু আমি জানি যে, আল্লাহ্ তা'লা এবং মুমিনগণ তাকে ব্যতীত আর কাউকে গ্রহণ করবে না। তাই আমি কিছুই করছি না। অর্থাৎ তারা হযরত আবু বকরকেই নির্বাচিত করবে।

মোটকথা, সাহাবীগণ নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, রসূলে করীম (সা.)-এর পর তাদের মধ্যে যদি কেউ মর্যাদাবান থাকেন তবে তিনি হলেন আবু বকর (রা.)। আর তিনিই তাঁর খলীফা হবার যোগ্য। মক্কী জীবন তো এরূপ ছিল যে, তাতে রাষ্ট্রক্ষমতা এবং তার ব্যবস্থাপনার কোনো প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু মদীনাতে মহানবী (সা.)-এর আগমনের পর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় আর স্বভাবতই মুনাফিকদের হৃদয়ে এ প্রশ্ন সৃষ্টি হতে থাকে যে, তাঁর পর কেউ খলীফা হয়ে ইসলামী শাসন দীর্ঘায়িত না হয়ে যায় এবং আমরা চিরকালের জন্য ধ্বংস না হয়ে যাই। অর্থাৎ বিরোধীদের এই চিন্তা হয়, কেননা তাঁর (সা.) মদীনায় আগমনের ফলে তাদের বহু আশা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, মদীনায় আরবদের দুটি গোত্র অওস এবং খাযরাজ সর্বদাই একে অপরের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত থাকতো এবং তাদের মধ্যে হত্যা ও রক্তপাত লেগেই থাকত। যখন তারা দেখল যে, এ লড়াইয়ের ফলে আমাদের গোত্রের প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাস পাচ্ছে, তখন তারা নিজেদের মাঝে সন্ধির উদ্যোগ নেয় এবং অঙ্গীকার করে যে, আমরা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হব এবং কোনো এক ব্যক্তিকে আমাদের রাজা বানাব। সুতরাং অওস এবং খাযরাজ গোত্র নিজেদের মাঝে সন্ধি করে নেয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলকে মদীনার রাজা বানানো হবে। এই সিদ্ধান্তের পর তারা প্রস্তুতিও আরম্ভ করে দেয় আর আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলের জন্য মুকুট বানানোর নির্দেশও দিয়ে দেওয়া হয়। এরই মাঝে মদীনার কিছু হাজী মক্কা থেকে ফেরত আসে এবং তারা বলে, শেষ যুগের নবী মক্কায় আগমন করেছেন এবং আমরা তাঁর হাতে বয়আত করে এসেছি। তখন রসূলে করীম (সা.)-এর দাবি সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হয়ে যায়। এর ফলে মহানবী (সা.)-এর দাবি সম্পর্কে কানাঘুষা আরম্ভ হয়ে গেল এবং কিছুদিন পর আরো কিছু মানুষ মক্কায় এসে মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আত করেন। অতঃপর তারা মহানবী (সা.)-এর নিকট নিবেদন করেন, আপনি আমাদের তরবিয়ত ও তবলীগের জন্য কোনো শিক্ষক আমাদের সাথে প্রেরণ করুন। অতএব মহানবী (সা.) একজন সাহাবীকে মুবাল্লিগ হিসাবে প্রেরণ করেন আর মদীনার অনেক মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। সে দিনগুলোতে যেহেতু মক্কায় মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের ওপর নিদারুণ অত্যাচার চালানো হচ্ছিল, তাই মদীনাবাসী মহানবী (সা.)-এর নিকট নিবেদন করেন, আপনি মদীনায় আগমন করুন। ফলে মহানবী (সা.) সাহাবীদের নিয়ে মদীনায় হিজরত করে চলে আসেন আর আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলের জন্য যে মুকুট প্রস্তুত করা হচ্ছিল তা নিরাশাই রয়ে গেল, কেননা যখন তারা অর্থাৎ মদীনাবাসীরা দোজাহানের বাদশাকে পেয়ে গেল তখন তাদের অন্য বাদশার কী-ইবা দরকার!

আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল যখন এটি দেখল যে, তার বাদশা হবার সকল সম্ভাবনা হারিয়ে যাচ্ছে তখন সে ভীষণ রাগান্বিত হয়। আর যদিও বাহ্যত সে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সর্বদা ইসলামে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করত এবং যেহেতু সে আর কিছু করতে পারছিল না, তাই তার হৃদয়ে এই বাসনা জাগ্রত হলো যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) মৃত্যু বরণ করবে এবং আমি মদীনার বাদশা হবো। খোদা তা'লা তাকে এ উদ্দেশ্যেও অপদস্থ করলেন, কেননা তার ছেলে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিল। এর অর্থ ছিল, সে যদি বাদশা হয়েও যেত তবে তার পরে রাজত্ব ইসলামের অধীনেই চলে আসত। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা এটিকে এভাবেও ধূলিসাৎ

করেন যে, মুসলমানদের মাঝে যখনই নতুন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হলো তখন তারা মহানবী (সা.)-কে এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করা আরম্ভ করে যে, ইসলামী শাসনব্যবস্থার পদ্ধতি কী? আপনার পর ইসলামের কী হবে এবং এ বিষয়ে মুসলমানদের করণীয় কী? আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল যখন এহেন অবস্থা দেখতে পেল তখন তার ভয় হতে লাগল যে, এখন তো ইসলামী শাসনব্যবস্থা এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে তার কোনো ভূমিকা থাকবে না। সে এসব অবস্থা প্রতিহত করতে চাইত। অতঃপর এজন্য যখন সে মনোনিবেশ করল তখন সে লক্ষ করল, ইসলামী শাসনব্যবস্থাকে ইসলামী নীতির ওপর যদি কেউ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তবে তিনি হলেন হযরত আবু বকর (রা.) আর মহানবী (সা.)-এর পর মুসলমানদের দৃষ্টি তাঁর প্রতি নিবদ্ধ এবং তারা তাঁকে সবার চেয়ে সম্মানিত মনে করেন। ফলে সে নিজের মঙ্গল এতেই মনে করল যে, তাঁকে বদনাম করা হোক এবং মানুষের দৃষ্টি থেকে তাঁকে নীচে পতিত করা হোক, বরং স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর চোখেও তাঁকে খাটো করা হোক। আর হযরত আয়েশা (রা.)-র একটি যুদ্ধে পেছনে থেকে যাবার ঘটনা থেকে সে এই মন্দ উদ্দেশ্য পূরণের সুযোগ পেয়ে যায় এবং এই দুরাচারী তার প্রতি চরম নোংরা একটি অপবাদ আরোপ করে যা কুরআন করীমে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে, কিন্তু হাদীসে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলের এটি করার উদ্দেশ্য ছিল, এর ফলে হযরত আবু বকর (রা.) সেসব মানুষের দৃষ্টিতেও লাঞ্ছিত হয়ে যাবেন এবং মহানবী (সা.)-এর সাথেও তাঁর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে আর এই ব্যবস্থাপনা– যা সে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হতে দেখতে পাচ্ছিল এবং যার প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছিল, তার মাঝে ফাটল দেখা দেবে। কেননা মুনাফিক নিজের মৃত্যুকে সর্বদা সুদূর পরাহত মনে করে; অথচ সে এটি জানত না যে, মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই ছটফট করতে করতে মরবে। সে এই দিবাস্বপ্নই দেখে যাচ্ছিল যে, মহানবী (সা.) মারা গেলে আমি আরবের বাদশা হবো; কিন্তু এখন সে দেখল, আবু বকর (রা.)-র পুণ্য, তাকওয়া এবং শ্রেষ্ঠত্ব মুসলমানরা স্বীকার করে নিয়েছে। যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) নামায পড়াতে আসেন না তখন আবু বকর তাঁর স্থলে নামায পড়ান। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছ থেকে কোনো ফতোয়া জিজ্ঞেস করার সুযোগ না থাকলে মুসলমানরা আবু বকর (রা.)-কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। এটি দেখে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল, যে ভবিষ্যতে রাজা হবার বাসনা লালন করছিল, খুবই চিন্তিত হলো। সে এর সুরাহা করতে চাইল। এই বিষয়টির সুরাহা করার জন্য এবং হযরত আবু বকর (রা.)-র খ্যাতি ও তাঁর মর্যাদাকে মুসলমানদের দৃষ্টিতে ধূলিসাৎ করার জন্য সে হযরত আয়েশা (রা.)-র ওপর অপবাদ আরোপ করল, যেন হযরত আয়েশা (রা.)-র বিরুদ্ধে দুর্নাম রটে যাবার কারণে হযরত আয়েশা (রা.)-র প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ঘৃণা সৃষ্টি হয়। আর যেন হযরত আয়েশা (রা.)-র প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ঘৃণার ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং মুসলমানদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.)-র যে মর্যাদা রয়েছে তা কমে যায় এবং তাঁর (রা.) ভবিষ্যত খলীফা হবার কোনো সুযোগ না থাকে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) হযরত আবু বকরের (রা.) খিলাফতের সাথে ইফকের ঘটনার সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে আরো লিখেন, সূরা নূরের শুরু থেকে এর শেষ পর্যন্ত একটি বিষয়বস্তুই বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে সেই অপবাদ আরোপের উল্লেখ করা হয়েছে যা হযরত আয়েশা (রা.)-র ওপর আরোপ করা হয়েছিল। আর যেহেতু হযরত আয়েশার (রা.) ওপর অপবাদ আরোপের মূল উদ্দেশ্য ছিল হযরত আবু বকরকে (রা.) অপমানিত করা, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে তাঁর যে সম্পর্ক তা নষ্ট করা, এর ফলে যেন মুসলমানদের

দৃষ্টিতে তাঁর সম্মানহানি হয় এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মৃত্যুর পরে তিনি খলীফা হতে না পারেন, কেননা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল বুঝে গিয়েছিল রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পরে মুসলমানদের দৃষ্টি কারো প্রতি নিবদ্ধ হলে সেটা আবু বকরই হবেন। যদি আবু বকর (রা.)-র মাধ্যমে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাহলে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলের ক্ষমতা লাভের স্বপ্ন কখনো পূর্ণ হবে না। এজন্য আল্লাহ্ তা'লা এই অপবাদের পরপরই খিলাফতের উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, খিলাফত সাম্রাজ্য নয়, বরং সেটি তো ঐশী নূরকে প্রজ্বলিত রাখার একটি মাধ্যম। এজন্য এর প্রতিষ্ঠা আল্লাহ্ তা'লা নিজ হাতে রেখেছেন। এর বিনষ্ট হওয়া নবুওয়্যতের নূর এবং ঐশ্বরিক নূরের বিনাশের নামান্তর। অতএব তিনি অবশ্যই এই নূরকে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যাকে চাইবেন খলীফা বানাবেন; বরং তিনি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, মুসলমানদের মধ্য থেকে একজন নয় বরং বেশ কিছু ব্যক্তিবর্গকে খিলাফতের আসনে সমাসীন করে এই নূরের যুগকে দীর্ঘায়িত করবেন। তোমরা যদি অপবাদ আরোপ করতে চাও তাহলে নিঃসন্দেহে আরোপ করো, কিন্তু তোমরা খিলাফতকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না এবং আবু বকরকেও খিলাফত থেকে বঞ্চিত রাখতে পারবে না, কেননা খিলাফত একটি নূর, এটি আল্লাহ্‌র নূর প্রকাশের একটি মাধ্যম। এটিকে মানুষ নিজের প্রচেষ্টায় কীভাবে ধ্বংস করতে পারে!

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, নবীগণের অবস্থাও তদ্রূপই হয়, যখন খোদা তা'লা কোনো বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দেন তখন তারা সে বিষয়কে গ্রহণ করেন অথবা সরে যান। লক্ষ করো! আয়েশার (রা.) ইফকের ঘটনা প্রথমে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জানানো হয় নি, এমনকি পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে চলে যায় যে, হযরত আয়েশা (রা.) নিজের পিত্রালয়ে চলে যান। মহানবী (সা.) এতদূর পর্যন্ত বলেন, যদি পাপ করে থাকো তাহলে তওবা করো। এসব ঘটনাবলি দেখে স্পষ্ট বুঝা যায়, তিনি (সা.) কতটা আবেগাপ্লুত ছিলেন, কিন্তু এই রহস্য একটা সময় পর্যন্ত তাঁর সামনে উন্মোচিত হয় নি। যখন খোদা তা'লা নিজ ওহী দ্বারা নির্দোষ হবার ঘোষণা দিলেন এবং বললেন,

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ (সূরা নূর-২৭)

তখন তিনি (সা.) উক্ত ইফকের প্রকৃত বিষয়ে অবগত হয়েছেন। এর ফলে মহানবী (সা.)-এর মর্যাদায় কি কোনো আঘাত লাগে? কখনো না। সেই ব্যক্তি জালেম এবং খোদাকে ভয় করে না যে এ ধরনের ধ্যানধারণা লালন করে। আর এটি কুফরি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মহানবী (সা.) এবং অন্যান্য নবী-রসূল কখনো এ দাবী করেন নি যে, তাঁরা আলেমুল গায়েব (তথা অদৃশ্যের বিষয়ে জ্ঞাত)। আলেমুল গায়েব তো খোদা তা'লার বৈশিষ্ট্য। এরা নবী-রসূলদের সুন্নত সম্বন্ধে অবগত থাকলে এ ধরনের অভিযোগ-অনুযোগ কখনো করতো না। এখনো যারা আপত্তি করে, তিনি তাদেরও নিরুত্তর করে দিয়েছেন।

মহানবী (সা.)-এর নেতৃত্বে অওস এবং খাযরাজ গোত্রের মাঝে সন্ধি স্থাপনের বিষয়েও উল্লেখ পাওয়া যায়। তাদের পরস্পরের মাঝে কিছু অধিক মনোমালিন্য দেখা দিয়েছিল। এক রেওয়ায়েতে উল্লিখিত আছে, মহানবী (সা.) কয়েক দিন পর হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-র হাত ধরেন এবং কতিপয় সাহাবীর সাথে তাকে নিয়ে বের হন এবং হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-র কাছে গিয়ে উপনীত হন। সেখানে কিছুক্ষণ কথা বলেন। হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.) খাবার উপস্থাপন করেন। মহানবী (সা.), হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবী সেখান থেকে খাবার খেলেন। এরপর তিনি (সা.) সেখান

থেকে চলে গেলেন। এরপর তিনি (সা.) কিছুদিন চুপচাপ থাকেন। এর কিছুদিন পর পুনরায় তিনি (সা.) হযরত সা'দ বিন উবাদার হাত ধরেন এবং কতিপয় সাহাবীকে সাথে নিয়ে এবারে হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-র ঘরে গিয়ে উপনীত হন। কিছুক্ষণ কথা বলেন। হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) খাবার পরিবেশন করেন আর তিনি (সা.), সা'দ বিন উবাদা (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবী খাবার খেলেন, এরপর তিনি (সা.) পুনরায় চলে গেলেন। তিনি (সা.) এমনটি করার কারণ হলো, তাদের হৃদয়ে পূর্বোক্ত কারণে যে মালিন্য সৃষ্টি হয়েছিল, তা যেন শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ একবার একজনকে নিয়ে অন্যজনের ঘরে গেলেন আবার পুনরায় দ্বিতীয়জনকে নিয়ে প্রথমজনের ঘরে গেলেন যেন তাদের পারস্পরিক মনোমালিন্য দূর হয়ে যায়, আর সেখানে খাবার খেলেন এবং তারা একে অপরকে খাবার খাওয়ালেন আর এভাবে মনোমালিন্য দূর হয়ে গেল। পরস্পরের মাঝে হৃদ্যতা ও সন্ধি স্থাপন করানোর ক্ষেত্রে এটিও তাঁর (সা.) একটি পদ্ধতি ছিল।

রেওয়ায়েতে অভিযোগ আরোপকারীদের ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-র একটি রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা.)-র প্রতি অভিযোগ আরোপকারীদের সংখ্যা বলা হয়েছে তিনজন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-র অপর একটি রেওয়ায়েত রয়েছে, তদনুযায়ী তাদের সংখ্যা ছিল তিন থেকে দশজন। ইবনে উয়াইনা তাদের সংখ্যা বলেছেন চল্লিশজন আর মুজাহিদ বলেছেন দশ থেকে পনেরজন। ইফকের ঘটনায় যারা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাদের শাস্তির বিষয়টিও জানা যায়। সুনান আবু দাউদ গ্রন্থে রেওয়ায়েত আছে যে, মহানবী (সা.) দুইজন পুরুষ এবং একজন মহিলাকে অপবাদ আরোপের কারণে শাস্তির আদেশ দিয়েছিলেন যারা অশ্লীলতার অভিযোগ আরোপ করেছিলেন। (দুজন ছিলেন) হযরত হাসসান বিন সাবেত এবং মিসতাহ বিন উসাসা। নুফায়লী বলেন যে, মানুষের ভাষ্যমতে সেই মহিলা ছিলেন হামনা বিনতে জাহাশ। আল্লামা মাওয়ারদী বলেন যে, ইফকের ঘটনায় সংশ্লিষ্টদের বেত্রাঘাত করার বিষয়ে মতানৈক্য আছে। একটি ভাষ্যমতে মহানবী (সা.) এদের মধ্য থেকে কাউকেই বেত্রাঘাত করান নি, আর অপর বর্ণনামতে মহানবী (সা.) আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই, মিসতাহ বিন উসাসা, হাসসান বিন সাবেত এবং হামনা বিনতে জাহাশকে বেত্রাঘাত করিয়েছিলেন। ইমাম কুরতুবী বলেন, রেওয়ায়েতে যে বিষয়টি খ্যাত এবং ওলামাদের কাছে সুবিদিত তা হলো, হাসসান, মিসতাহ এবং হামনাকে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল কিন্তু ইবনে উবাইকে শাস্তি দেওয়ার বিষয়টির উল্লেখ পাওয়া যায় না।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এক খুতবায় উক্ত বিষয়ে বলেছিলেন যে, হযরত আয়েশা (রা.)-র প্রতি অপবাদ আরোপ করার কারণে তিন ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল যাদের মাঝে একজন ছিলেন হযরত হাসসান বিন সাবেত, যিনি মহানবী (সা.)-এর শানে কবিতা লেখার ক্ষেত্রে উন্নত মার্গে উপনীত ছিলেন। আরেকজন ছিলেন মিসতাহ যিনি সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.)-র চাচা ছিলেন আর হযরত আবু বকর (রা.)-র খালাতো ভাই ছিলেন। তিনি এতই দরিদ্র ছিলেন যে, হযরত আবু বকর (রা.)-র বাড়িতেই থাকতেন, সেখানেই খাবার খেতেন আর তিনিই তার জন্য কাপড় তৈরি করে দিতেন। এছাড়া এক নারীও তাদের সাথে ছিল; এ তিনজনের শাস্তি হয়েছিল।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা নূরের ৩৬নং আয়াতের তফসীরে আরও লিখেছেন। তিনি (রা.) ইবনে সলূলকে চাবুক মারার বিষয়টির উল্লেখ করেছেন। সেক্ষেত্রে তিনি বলেন,

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ

অর্থাৎ, এই অপবাদ আরোপকারীদের মধ্যে যে ব্যক্তি যেরূপ অপকর্ম করেছে তেমনই শাস্তি সে পাবে। অতএব, যারা অপবাদ আরোপের ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল তাদেরকে আশিটি করে চাবুকাঘাত করা হয়েছিল। তিনি আরো বলেন,

وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

কিন্তু তাদের মধ্যে একজন যে সবচেয়ে বড়ো দুষ্কৃতকারী এবং যে এ সমস্ত অপকর্মের হোতা অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল, আমরা তাকে শুধু বেত্রাঘাতই করব না, বরং নিজেরাও তার শাস্তি দেব। অতএব এই শাস্তির প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাকে বেত্রাঘাতের শাস্তিও দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকেও শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে এবং রসূল করীম (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই সে চরম লাঞ্ছনার সাথে মৃত্যু বরণ করে।

এ ঘটনা এখানেই শেষ হচ্ছে। জার্মানির জলসার ব্যাপারে এতটুকুই বলতে চাই, অংশগ্রহণকারীদের মাঝে অআহমদী বা যারা প্রথমবারের মতো এসেছেন তারা দারুণ ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, সন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ করেছেন এবং পরিবেশের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। একইসাথে গণমাধ্যম ও সংবাদের মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষের কাছে আহমদীয়াত ও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা পৌঁছেছে। জলসা এ দৃষ্টিকোণ থেকেও তবলীগের একটি বড়ো মাধ্যম। যেখানে আমরা পৌঁছাতে পারি না সেখানে এর মাধ্যমে তবলীগের কাজ হয়, ইসলামের বাণী পৌঁছে যায়। আল্লাহ্ তা'লা এর উত্তম ও সুদূরপ্রসারী ফলাফল বয়ে আনুন এবং আহমদীদেরও সর্বদা প্রকৃত অর্থে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন ।

দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর করুণা ও রহমতের চাদরে আবৃত রাখুন।

পরিশেষে আমি একজন মরহুমের স্মৃতিচারণও করব এবং আমি তার জানাযা পড়াবো, ইনশাআল্লাহ্। ইমাম মুহাম্মদ বেলু সাহেব, যিনি সুদানের অধিবাসী ছিলেন, সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। সুদান জামাতের প্রেসিডেন্ট তার সম্পর্কে লিখেছেন, তার বয়আতের ঘটনা হলো, ১৯৬৬ সালে নাইজেরিয়া থেকে একজন আহমদী ইমাম ঈসা আবদুল্লাহ্ বিন লাইল তার বাড়িতে অতিথি হিসাবে এসেছিলেন এবং গ্রামবাসীকে তবলীগ করেছিলেন। মরহুম ইমাম মুহাম্মদ বিন বেলুর সর্বপ্রথম বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ হয়। তখনকার দিনে যুগ-খলীফার সাথে সুদানের কেন্দ্রের যোগাযোগ করা সম্ভব ছিল না, তথাপি এই আহমদী বন্ধুরা আহমদীয়াতের বিশ্বাসে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাদের প্রচণ্ড বিরোধিতা হয়েছিল। ইমাম মুহাম্মদ বেলু সাহেব আহমদীদের নামাযে ইমামতি করতেন। সেখানে আহমদীরা ঘাস ও খড় দিয়ে তৈরি একটি কুঁড়েঘরের মতো মসজিদ তৈরি করেছিল, যাতে অআহমদীরা আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে আহমদীদের গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়। এতে আহমদীরা দক্ষিণে হিজরতে করে। সেখানেও আহমদীরা ঘাস ও খড় দিয়ে তৈরি একটি কুঁড়েঘরের মতো মসজিদ তৈরি করে। সেখানেও বিরোধিতা হয় এবং বিরোধীরা আহমদীদের মসজিদ পুড়িয়ে দেয় এবং আহমদীদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। সেখানকার আহমদীদের একটি দল দূরে কোথাও হিজরত করেন আর বাকিরা আরেকটি শহরে চলে যান যাদের মাঝে ইমাম বেলুও ছিলেন। সেখানে এ লোকেরা আব্দুল্লাহ্ বিন অওয কাসেম সাহেবের অতিথি হয়েছিলেন, যিনি জামিয়া বখতুর রেযার প্রিন্সিপাল ছিলেন, কিন্তু তার বংশের লোকেরা বিরোধিতা করল এবং এই আহমদীদের সেখান থেকে বের করে দিল। সেখান থেকেও এই

অসহায়দের বিতাড়িত করা হয়। অবশেষে তারা নাইজেরিয়ায় ইমাম ঈসা আব্দুল্লাহ্ লাইল সাহেবের নিকটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যার মাধ্যমে তারা আহমদী হয়েছিলেন। অতঃপর দরিদ্র আহমদীদের এই দল স্ত্রী-সন্তানসহ গাধা ও অন্যান্য পশুর পিঠে আরোহণ করে আর অধিকাংশ পায়ে হেঁটে নাইজেরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাদের কাছে কোনো পাথেয় ছিল না, ভিসা ও অন্যান্য কাগজপত্রও ছিল না। যাত্রাও বড়োই দুষ্কর ছিল। হ্যাঁ, তাদের কাছে কেবলমাত্র ঈমানের সম্পদ ছিল। তারা নিজেদের ঈমান খুবই সযত্নে রেখেছিলেন। সেই (ঈমানের) স্পৃহা ও উদ্দীপনার সাথে হিজরত অব্যাহত রাখেন। কখনো স্বীয় ধর্মকে বিসর্জন দেন নি। অবশেষে তারা নাইজেরিয়াতে পৌঁছেন। সেখানে তারা ইমাম ঈসা বিন লাইল সাহেবের কাছে তেরো বছর অবস্থান করেন। এরপর ইমাম ঈসা সাহেব একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে তাদেরকে পুনরায় সুদানে ফিরে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। তারা একথা অপছন্দ করেন। তখন ইমাম ঈসা সাহেব তাদেরকে বলেন, এটি আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আদেশ করা হয়েছে। এর ফলে তারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুদানে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। ইমাম ঈসা সাহেবকে স্বপ্নে বলা হয়েছিল, তারা তিন বছর পর সুদানে ফিরে যাবেন। তিন বছর পূর্ণ হলে এই আহমদী মুহাজির দল নিজ দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সর্বপ্রথম ইমাম মুহাম্মদ বেলু সাহেব ফিরে যান। সুদানে তারা নিজেদের পূর্বের গ্রাম কুনেযায় গিয়ে থিতু হন। এটি ২০১০ সালের ঘটনা। এই আহমদীদের সুদানে যাওয়ার পর নাইজেরিয়াতে 'বোকো হারাম' নামের এক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই সুদানী আহমদীরা যদি সেই সময় নাইজেরিয়াতে অবস্থান করতেন তবে আল্লাহ্ই ভালো জানেন এই সংগঠন তাদের সাথে কী আচরণ করত। তখন তারা বুঝতে পারেন, নাইজেরিয়া থেকে তাদের প্রত্যাবর্তনের পেছনে কী ঐশী প্রজ্ঞা অন্তর্নিহিত ছিল। তবুও কুনেযায় ফিরে আসার পর তাদেরকে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। তারা যে ছোটো মসজিদ বানিয়ে ছিলেন তা আবার পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তাদের ঘরবাড়ি আক্রান্ত হয়। তাদের নামে মামলামোকাদ্দমা দায়ের করা হয়। তাদেরকে গ্রাম থেকে পুনরায় বের করে দেয়া হয়। পরিশেষে বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায় যার ফলে সমগ্র সুদান জুড়েই অবস্থার অবনতি ঘটে আর সেখানে কেউই আর নিরাপদ থাকল না। এই আহমদীরাও নিজেদের জীবন রক্ষা এবং নিরাপত্তা লাভের খাতিরে সুদানের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্ত হয়ে যান। বর্তমানেও তারা বিভিন্ন এলাকায় খুবই অভাব-অনটন ও দারিদ্রের মাঝে জীবন যাপন করছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন, (তার সাথে) ক্ষমার আচরণ করুন; অন্যান্য আহমদীদের ঈমানকে সুদৃঢ় রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের অবস্থারও পরিবর্তন করুন। যেমনটি আমি বলেছি, দেশে ভীষণ বিশৃঙ্খলা চলমান রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এই বিবাদ-বিশৃঙ্খলা দূরীভূত করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি কৃপা করুন, তারা যেন পরস্পরের অধিকার প্রদানকারী হয়, মুসলমান মুসলমানের ভাই হওয়ার যে অধিকার তা যেন আদায়কারী হয়। ইসলামী দেশসমূহে যে বিশৃঙ্খলা বিরাজমান আল্লাহ্ তা'লা তা দূর করুন এবং আহমদীদেরকে প্রকৃতার্থে শান্তি ও নিরাপত্তার জীবন অতিবাহিত করার সৌভাগ্য দান করুন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)